ভবঘুরে শাস্ত্র

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অনুবাদ

রণজিৎ সিংহ

ঐতিহ্য

প্রথম সংস্করণে লেখকের বক্তব্য

'ভবঘুরে শাস্ত্র' লেখার প্রয়োজনীয়তা আমি অনেক দিন থেকে অনুভব করছিলাম। আমার মনে হয় অন্যান্য সমধর্মী বন্ধুরাও এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন। ভবঘুরেমির অঙ্কুর জাগানো এই শাস্ত্রের কাজ নয়; বরং যে অঙ্কুর মাথা তুলেছে তার পুষ্টি ও পরিবর্ধন তথা পথ প্রদর্শন এ বইয়ের লক্ষ্য। ভবঘুরের পক্ষে উপযোগী সমস্ত কথা সূক্ষ্ম রূপে এখানে এসে গিয়েছে, এমন কথা বলা উচিত হবে না, কিন্তু যদি আমার ভবঘুরে বন্ধুরা তাঁদের জিজ্ঞাসা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সাহায্য করেন, তাহলে আশা করি, পরের সংস্করণে এর অপূর্ণতা অনেকটা দূর করা যাবে।

এ বই লেখার ব্যাপারে যাঁদের আগ্রহ ও প্রেরণা আমাকে উৎসাহিত করেছে তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রীমহেশজী এবং শ্রীকমলা পারিয়ার (বর্তমানে সাংকৃত্যায়ন) এ ব্যাপারে আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তার জন্যে তাঁদের আমি আমার নিজের ও পাঠকের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের সাহায্য ছাড়া আমার বহু বছরের পরিকল্পনা কাগজের পাতায় রূপ নিতে পারত না।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

সূচি

রাহুল বীক্ষা ৯
অথ ভবঘুরে জিজ্ঞাসা ১৩
জঞ্জাল হটাও ২২
বিদ্যা ও বয়স ৩৩
স্বাবলম্বন ৪২
শিল্প ও কলা ৫১
অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে ৫৯
ভবঘুরে জাতিগুলির মধ্যে ৭১
মহিলা ভবঘুরে ৮১
ধর্ম ও ভবঘুরেমি ৮৯
প্রেম ৯৮
দেশ জ্ঞান ১০৬
মৃত্যু-দর্শন ১১৫
কলম আর তুলি ১২৪
উদ্দেশ্যহীন ১৩২
তরুণীদের কর্তব্য ১৪০
স্মৃতি ১৪৭

রাহুল বীক্ষা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন (৯. ৪. ১৮৯৩—১৪. ৪. ১৯৬৩)। বাবা গোবর্ধন পাণ্ডে, মা কুলওয়ন্তী। উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলায় মাতামহ রামশরণ পাঠকের গৃহে জন্ম। নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবারের সন্তান বিশাল বিশ্বের পাঠশালা থেকে যে বিচিত্র জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে সমকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও চিন্তাবিদ্ হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠ করেন তার ইতিহাস অভিনব এবং তুলনাহীন। কখনো পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সঙ্ঘে, কখনো আর্যসমাজী আখড়ায়, কখনো কাশী বা আগ্রার টোল কিংবা মাদ্রাসায় একই সঙ্গে জ্ঞানার্জন এবং ভারতদর্শন শুরু হয়—মাত্র ন' বছর বয়স থেকে। ২০ বছর বয়সে মা-বাবার দেওয়া নাম কেদারনাথ পাণ্ডে পরিবর্তিত হয়ে রামউদর দাস হয়। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামে পরিচিত হন। বুদ্ধের যে অনুশাসনের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রাহুলের পরবর্তী জীবনের পথ-প্রদর্শক, সেই পথ অনুসরণ করেই তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, "উনকে (বুদ্ধ) উপদেশ কা পালন করতে হুএ হী ম্যায় ক্ষণিক (দ্বন্দ্বাত্মক) অন্-আত্মবাদ সে দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকবাদ পর পহুঁচা।" মাতৃভাষা ভোজপুরী এবং হিন্দী, সংস্কৃত ও তিব্বতী ভাষায় লেখা গল্প-উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনী, জীবনী, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন পুথি সম্পাদনা ইত্যাদি মৌলিক ও সম্পাদিত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২৭। একাধারে প্রতিভাবান সাহিত্য-স্রষ্টা এবং সার্বভৌম পাণ্ডিত্যের অধিকারী রাহুল শুধু হিন্দী ভাষাতেই নয়, সমগ্র ভারতেই এক বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব।

পূর্ব অনুচ্ছেদে খুব সহজভাবে রাহুল সাংকৃত্যায়ন সম্পর্কে যে সব বিশেষণ ব্যবহার করলাম সেগুলিকে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের পটভূমিতে বিশ্লিষ্ট করা এই ছোট পরিসরে সম্ভব নয়। তবুও সাধারণভাবে রাহুল সম্পর্কে

একটা স্বচ্ছ ধারণা পেতে হলে অন্তত পক্ষে তিনটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমত তাঁর চিন্তাধারার ক্রম-উত্তরণ, দ্বিতীয়ত বহু ব্যাপ্ত বিষয়ে তাঁর রচনাসম্ভার, তৃতীয়ত জীবনের প্রায় ৭০ শতাংশ সময় পর্যটন এবং সেই সূত্রে সর্ব বিষয়ে সজীব ঔৎসুক্য এবং শিক্ষাগ্রহণ। আমার নিজের মনে হয়, রাহুলের চরিত্রের যে তৃতীয় বিশেষত্বটির কথা উল্লেখ করা হলো তার মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর মানসিক ক্রম-উত্তরণের ব্যাখ্যা। আবার যেহেতু তিনি উদাসীন বা আত্মতুষ্ট পর্যটক ছিলেন না সেই কারণেই কোনো স্বল্পকালীন অবকাশ বা সুযোগ পেলেই কলম নিয়ে বসে গেছেন। ফলে তাঁর ৭০ বছরের জীবনকে যদি ৭০ মিনিটের সেলুলয়েডের পাতে তুলে নেওয়া সম্ভব হতো তাহলে আমরা দেখতাম—একজন মানুষ পথ চলছেন, নতুন যা কিছু দেখছেন শিখে নিচ্ছেন এবং সেই ভ্রাম্যমাণ মানুষটি লিখে চলেছেন ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে। আর ঐ পথ চলার সূত্রেই তিনি আর্যসমাজী সাধু থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ সন্তান বেদ-বিরোধী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে পরবর্তীকালে "ধর্মকে বিষবালে দাঁত তোড় দিয়ে গয়ে"— করার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কৃষক আন্দোলনের মধ্যে। ঐ পর্যটনের সূত্রেই অর্জিত পাণ্ডিত্যকে স্বীকৃতি জানিয়েছে লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাচ্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক পদে (১৯৪৪-৪৭) তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং সিংহলের বিদ্যালঙ্কার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে (১৯৫৯-৬১) বরণ করে।

রাহুলের চিন্তা ও চেতনার উত্তরণের কারণ হিসাবে— তাঁর পর্যটকের জীবনকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি বিশাল রচনাবলীর উৎস ভূমি অত সহজে নির্ণয় করা যাবে না। এ কথা সত্যি, রাহুলজীর লেখাকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত, গতিশীল এবং সর্বজনসংবাদী করার পেছনে ভ্রাম্যমাণের জীবন অনেকটা সাহায্য করেছিল। লেখকের কলম নিয়ে কেউই জন্মগ্রহণ করেন না, লেখক যিনি হন তিনি নিজেকে তৈরী করে নেন— কঠোর শ্রম এবং বহুমাত্রিক জীবনের নানা স্তর থেকে আহৃত নানা অভিজ্ঞতার উপাদানে। তাই যখন রাহুলজীর ঘটনাময় বর্ণাঢ্য জীবনচর্যার পাশাপাশি তাঁর রচনাসম্ভারের দিকে তাকানো যায় তখন অনিবার্যভাবেই এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়— রাহুলজী কি তাঁর সমগ্র কর্মময় জীবনকে তাঁর রচনার সূতিকাগার হিসাবেই চেয়েছিলেন? এই প্রশ্নের সুনিশ্চিত ইতিবাচক উত্তর প্রবল হয়ে ওঠে রাহুলজীর জীবনের ঘটনা পরম্পরায়, যার মধ্যে থেকে তিনটির উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক।

রাহুলজীর প্রথম মৌলিক গ্রন্থ ১৯২২-২৩ সাল নাগাদ লেখা। তারপর ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হাজারীবাগ জেলে ইংরেজ সরকারের রাজবন্দী। কিন্তু প্রথম মৌলিক গ্রন্থ রচনার পর জেল-বন্দী থাকাকালীন পরপর চারটি বই হিন্দীতে অনুবাদ করলেন। আমরা তো জানি, সে সময়ের অসহযোগী আন্দোলনকারীরা জেলে বসে চরকায় সুতো কাটাকেই পরম কর্তব্য মনে করতেন। কিন্তু সেই অসহযোগীদের দলে ভিড়ে রাহুলজী জেলের মধ্যে অনুবাদ-কর্ম শুরু করে দিলেন। এই ঘটনা থেকে এটা কি ভাবলে খুব ভুল হবে— নিজের লেখা প্রথম বইয়ের অসম্পূর্ণতা এবং দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য অনুবাদের নীরস কর্মে নিজের কলমকে রাহুলজী শান দিয়ে নিচ্ছিলেন কারাবাসের অখণ্ড অবসরে? অতঃপর ১৯৪০-৪২ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করেছে এবং অসংখ্য কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে তৎকালীন সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি রাহুল সাংকৃত্যায়নও ২৯ মাস কারারুদ্ধ থেকেছেন। কিন্তু সর্ব ভারতীয় কৃষক সভার সভাপতি কারাবাসের সময়টা খরচ করলেন 'বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ' 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন' 'মানব সমাজ' 'বৌদ্ধ দর্শন' এবং 'বিশ্ব কি রূপরেখা' লিখে। সব বইগুলির মধ্যেই সাম্যবাদী চিন্তা ও চেতনার উজ্জ্বল উপস্থিতি অবশ্যই লক্ষণীয়। কিন্তু তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং নেতৃত্ব এবং তারই শ্রেণী-সংগঠনের সভাপতি জেলে বসে যে ধরনের বই লিখলে সময়োপযোগী হতো তা' না করে রাহুলজী তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক পুরোগামী কাজ সম্পন্ন করলেন। তিনি তাঁর নেতৃত্বাধীন সংগঠনের সমস্যা-আন্দোলন, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে কিছু লিখলেন না, লিখলেন পরবর্তী দুই প্রজন্মের অগ্রগামী বাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলার মতো হাতিয়ার। তৃতীয় ঘটনা, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে রাহুলজীর সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছে কিন্তু রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অর্জিত সর্বোচ্চ মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দেননি। তাই ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা মাও সে-তুঙ-এর জীবনী যেখানে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মাওকে সমগ্র এশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শের মহান্ পথিকৃৎ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আবার ১৯৫৮ সালে সাড়ে চার মাস গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সফর করে এসে লিখলেন 'চীন মে ক্যা দেখা' (১৯৬০) যেখানে কমিউনিস্ট চীনের বিপুল কর্মোদ্যোগের সপ্রশংস উল্লেখ বারম্বার পাওয়া যাবে।

আমার প্রতিপাদ্য এই নয় যে, রাহুল সাংকৃত্যায়নের সামগ্রিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্ব ভবঘুরেমি, বা সার্বভৌম পাণ্ডিত্য অথবা শ্রেণী-সচেতন

রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ গৌণ বিচার্য বিষয়। বরং আমি মনে করি, জীবনের যত বিচিত্র পথে রাহুলের পদচিহ্ন পড়েছে সেখানেই আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার। কিন্তু সেই কাজ করলে এই সিদ্ধান্তই দৃঢ়মূল হবে যে, রাহুলজীর মূল লক্ষ্য ছিল একটাই—এমন কিছু লেখা যা আগামী দিনের শ্রেণীহীন, শোষণহীন, সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লবের টুক্‌রো-টাক্‌রা খবর আর মার্কস্‌বাদের সামান্য ধ্যান-ধারণা নিয়ে রামউদর দাস নামের যে হিন্দু সন্ন্যাসীটি এক কল্পলৌকিক সাম্যবাদী পৃথিবীর কাহিনী রচনা করেছিলেন তিনিই পরবর্তী জীবনে মার্কস্‌বাদের আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রাহুল সাংকৃত্যায়ন। কিন্তু যৌবনে দ্বাবিংশ শতাব্দীর যে-স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তাকেই মাটির পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে, শ্রী প্রভাকর মাচওয়ের হিসাব অনুযায়ী পঞ্চাশ সহস্রাধিক পৃষ্ঠা আমাদের জন্যে রেখে গেছেন যা এ দেশের ভূত-ভগবান-ভাগ্য নির্ভর মানুষের চেতনাকে ভ্রান্তিমুক্ত করার সহায়ক হিসাবে আজ আমরা শ্রদ্ধাবনত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছি।

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

অথ ভবঘুরে জিজ্ঞাসা

সংস্কৃত কথা দিয়ে বই শুরু করছি বলে পাঠক রাগ করবেন না। আসলে আমিও শাস্ত্র লিখতে বসেছি। আর শাস্ত্রের পারিপাট্য তো মানতেই হবে। সব শাস্ত্রে বলা হয়েছে জিজ্ঞাসা এমন বিষয়ে হওয়া উচিত যা কি-না শ্রেষ্ঠ আর তা যেন ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে হিতকর হয়। ব্যাস নিজের শাস্ত্রে ব্রহ্মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মেনে নিয়ে তাঁকেই জিজ্ঞাসার বিষয় বানালেন। ব্যাস শিষ্য জৈমিনি ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মানলেন। প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে মতভেদ পোষণ করা আমার পক্ষে পাপ নয়, বস্তুত ছয় শাস্ত্রের রচয়িতা ছয় আস্তিক ঋষির অর্ধেক ভাগ তো ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকারই করেছেন। আমার বিবেচনায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু হলো ভবঘুরেমি। ভবঘুরের চেয়ে ব্যক্তি ও সমাজের হিতকারী আর কেউ হতে পারেন না। বলা হয়, ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্ম, ধারণ ও ধ্বংসের কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়েছেন। জন্ম দেওয়া আর ধ্বংস করা তো দূরের কথা তার যথার্থতা প্রতিপন্ন করার মতো প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা অনুমান কোনো কিছুরই সমর্থন মেলে না। আজ্ঞে হ্যাঁ, পৃথিবীকে ধারণ করার দায় ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহেশ্বর কারুর ওপরেই বর্তায় না। পৃথিবী দুঃখে থাকুন বা সুখে থাকুন, সব সময়ের জন্যে তিনি যদি কারুর কাছে ভরসা পেয়ে থাকেন তো পেয়েছেন ভবঘুরেদের কাছে। প্রাকৃতিক আদিম মানুষ পরম ভবঘুরে ছিলেন। চাষবাস, বাগ্ বাগিচা তথা ঘরদোর থেকে মুক্ত, আকাশের পাখির মতো তাঁরা সর্বদা পৃথিবীতে বিচরণ করতেন, শীতে যদি এখানে থাকেন তো গ্রীষ্মে এখান থেকে দুশ ক্রোশ দূরে।

আধুনিককালে ভবঘুরেদের কাজের কথা বলা দরকার। কারণ লোকে ভবঘুরেদের কীর্তি চুরি করে গলা ফাটিয়ে নিজের নামে প্রচার করে, তার থেকে পৃথিবী জানে বস্তুত কলুর বলদই পৃথিবীতে সব কিছু করে। আধুনিক বিজ্ঞানে চার্লস ডারুইনের স্থান অনেক উঁচুতে। তিনি যে শুধু প্রাণীর উৎপত্তি ও

মানব-বংশের বিকাশের ওপরেই অদ্বিতীয় কাজ করেছেন তাই নয়, সকল বিজ্ঞানকেই সাহায্য করেছেন। বলা উচিত যে, ডারুইনের আবিষ্কারের আলোকে সকল বিজ্ঞানকে নতুনভাবে চলতে হয়েছে। কিন্তু ডারুইনের মহান আবিষ্কারগুলি কি কখনই সম্ভব হতো যদি না তিনি ভবঘুরেমির ব্রত নিতেন?

আমি স্বীকার করি, বই পড়ে কিছুটা ভবঘুরেমির রস পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু ফটো দেখে আপনি হিমালয়ের গহন দেওদার বন এবং শুভ্র হিমমুকুট শিখররাজির সৌন্দর্য, তার রূপ, তার গন্ধ অনুভব করতে পারেন না; তেমনি ভ্রমণকাহিনী থেকেও আপনি সে জিনিসের স্বাদ কণামাত্র পাবেন না যা একজন ভবঘুরে নিত্য আস্বাদন করেন। ভ্রমণকাহিনী পাঠকের সপক্ষে বড় জোর এটা বলা যায় যে, তিনি আর সব অন্ধের তুলনায় কিছুটা দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হতে পারেন আর তার সঙ্গে এমন প্রেরণাও পেয়ে যেতে পারেন যা স্থায়ী না হোক অন্তত কিছুদিনের জন্যে হয়ত তাঁকে ভবঘুরে বানিয়ে দিলো। ভবঘুরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিভূতি-সম্পন্ন মানুষ কেন? এ জন্যেই যে, তিনি আজকের পৃথিবীকে বানিয়েছেন। আদিম মানুষ যদি নদী বা দীঘির ধারে গরম কোনো অঞ্চলে ঠায় পড়ে থাকতেন তাহলে তাঁরা পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন না। মানুষের ভবঘুরেমি যে বহুবার রক্তের নদী বইয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, আর আমরা কখনই চাই না যে, ভবঘুরে রক্তারক্তির রাস্তায় চলুন। কিন্তু ভবঘুরের দল যদি আসা যাওয়া না করতেন তাহলে দুর্বল মানবজাতিগুলি ঘুমিয়ে থাকত, পশুদের ছাড়িয়ে তারা ওপরে উঠতে পারত না। আদিম ভবঘুরেদের মধ্যে আর্য, শক, হুন কি কি করেছিল, তাদের খুনী পন্থার দ্বারা মানবতার পথকে কি ভাবে প্রশস্ত করেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতিহাসে পাই না, কিন্তু মোঙ্গল ভবঘুরেদের কেরামতির কথা তো আমরা ভালোভাবেই জানি। বারুদ, তোপ, কাগজ, ছাপাখানা, দূরবীণ প্রভৃতি জিনিসগুলিই পশ্চিমে বৈজ্ঞানিক যুগের সূচনা করল আর এগুলি সে দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন মোঙ্গল ভবঘুরে।

কলম্বাস ও ভাস্কো ডা-গামা দুজনেই ভবঘুরে ছিলেন। আর ওঁরাই পশ্চিমের দেশগুলোকে সামনে এগোবার রাস্তা খুলে দিলেন। আমেরিকা তখন অধিকতর নির্জন অবস্থায় পড়ে ছিল। এশিয়ার কূপমণ্ডূকেরা ভবঘুরে ধর্মের মহিমা ভুলে গিয়েছিলেন তাই তাঁরা আমেরিকার মাটিতে তাঁদের ঝাণ্ডা গাড়তে পারেননি। দুশতাব্দী আগে পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া খালি পড়ে ছিল। চীন ও ভারতের সভ্যতার বড় গর্ব, কিন্তু তাদের এটুকু আক্কেল হলো না যে, সেখানে গিয়ে নিজেদের ঝাণ্ডাটা গেড়ে আসে। আজ ভারত ও চীনের মাটি তাদের ৪০-৫০ কোটি লোকের ভারে বসে যাচ্ছে আর অস্ট্রেলিয়াতে এক কোটি

লোকও নেই। এশিয়াবাসীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দরজা আজ বন্ধ, কিন্তু দুশতাব্দী আগে সেটা আমাদের সামনে খোলা ছিল। কেন ভারত ও চীন অস্ট্রেলিয়ার অগাধ সম্পদ ও অপরিমিত ভূমি থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল? কারণটা এই যে তারা ভবঘুরে ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে ছিল, তাকে ভুলে গিয়েছিল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি একে ভুলে যাওয়াই বলব। কারণ একটা সময়ে তো ভারত আর চীন বড় বড় নামী ভবঘুরের জন্ম দিয়েছে! তাঁরা তো ভারতীয় ভবঘুরেই ছিলেন, যাঁরা দক্ষিণপূর্বে লঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়, যবদ্বীপ, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, বোর্নিও এবং সেলীবীজই নয় এমন কি ফিলিপাইন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আর একটা সময়ে তো এও মনে হয়েছিল যে নিউজিল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়া বৃহত্তর ভারতের অঙ্গ হতে চলেছে। কিন্তু হে কূপমণ্ডূকতা, তোমার বিনাশ হোক। এ দেশের মুখ্যুরাও উপদেশ ঝাড়তে শুরু করল যে, সমুদ্রের জলের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বড় বিবাদ, তাকে ছুঁলেই না-কি হিন্দুধর্ম নূনের পুতুলের মতো গলে যাবে।

এতটা বলার পর এ কথা কি আর বলা দরকার যে সমাজের কল্যাণের জন্য ভবঘুরে ধর্মের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ? যে জাতি বা দেশ এ ধর্মকে আপন করে নিয়েছে সে চতুর্বর্গ লাভ করেছে, আর যে একে দূরে ঠেলেছে তার নরকেও ঠাঁই হয়নি। বস্তুত ভবঘুরে ধর্ম ভোলার কারণেই আমরা সাত শতাব্দী ধরে ঠোক্কর খাচ্ছি— চুনোপুঁটি যারাই এসেছে, আমাদের লাথি কষিয়েছে।

আমি এই শাস্ত্রের পক্ষে এতক্ষণ যে সব যুক্তি দিলাম সেগুলো সবই লৌকিক তথা শাস্ত্রগ্রাহ্য বলে অনেকের হয়ত মন উঠবে না। বেশ, তাহলে ধর্ম থেকে প্রমাণ নেওয়া যাক। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মনায়ক ভবঘুরে ছিলেন। ধর্মাচার্যদের মধ্যে আচার-বিচারে, বুদ্ধি ও তর্কে তথা সহৃদয়তায় সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ছিলেন ভবঘুরে-শিরোমণি। যদিও তিনি ভারতের বাইরে যাননি, কিন্তু বর্ষার তিন মাস ছাড়া এক জায়গায় থাকা তিনি পাপ মনে করতেন। তিনি যে শুধু নিজেই ভবঘুরে ছিলেন তা নয়, গোড়ার দিকে শিষ্যদের তিনি বলতেন : "চরথ ভিক্খবে! চারিঙ্ক"। যার অর্থ, 'ভিক্ষুগণ! ভবঘুরেমি করো।' বুদ্ধের শিষ্যরা গুরুকে কতটা মেনেছেন সে কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে! তাঁরা কি পশ্চিমে মুকদেন তথা মিশর থেকে পূর্বে জাপান পর্যন্ত, উত্তরে মোঙ্গলিয়া থেকে দক্ষিণে বালী ও বাঁকার দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত চষে বেড়াননি? যে বৃহত্তর ভারতের জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে স্বাভাবিক গর্ববোধ রয়েছে তা কি ওইসব ভবঘুরের চরণধূলিতে গড়ে ওঠেনি? বুদ্ধই যে কেবল তাঁর ভবঘুরেমি থেকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন তা নয়, বুদ্ধের দু-এক শতাব্দী আগে থেকে

ভবঘুরেমির রীতিমতো চলন ছিল বলেই বুদ্ধের মতো ভবঘুরে-শিরোমণির আবির্ভাব আমাদের দেশে সম্ভব হয়েছিল। সে সময়ে কেবল পুরুষই নন, মেয়েরা পর্যন্ত জম্বু বৃক্ষের শাখা নিয়ে তাঁদের প্রখর প্রতিভার আলো ছড়াতেন এবং কূপমণ্ডূকদের বিধান অগ্রাহ্য করে মুক্ত মনে সারা ভারতে ঘুরে বেড়াতেন।

কোনো কোনো মহিলা জিগেস করবেন— মেয়েদের পক্ষে কি ভবঘুরেমি করা সম্ভব, তাঁরা কি এই মহাব্রতের দীক্ষা নিতে পারেন? এ বিষয়ে তো আলাদা অধ্যায়ই লেখার কথা, কিন্তু এখানে মাত্র এটুকু বলে দেওয়া যায় যে, ভবঘুরে ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতো সঙ্কীর্ণ নয়, যাতে মেয়েদের স্থান দেওয়া হয়নি। মেয়েদের এখানে ঠিক ততটাই অধিকার যতটা অধিকার পুরুষের। যদি কোনো নারী মানবজন্মের সাফল্য ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে কিছু করতে চান তাহলে তাঁকে এ ধর্ম গ্রহণ করতেই হবে। নারীকে ভবঘুরে ধর্ম থেকে বিরত করবার জন্যে পুরুষ তার সামনে বহু রকমের বাধা সৃষ্টি করেছে। বুদ্ধ যে কেবল পুরুষদেরই ভবঘুরেমি করতে বলেছেন তা নয়, মেয়েদের প্রতিও তাঁর উপদেশ ওই একই ছিল।

জৈনধর্মও ভারতের প্রাচীন একটি ধর্ম। জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা শ্রমণ মহাবীর কে ছিলেন? তিনিও ছিলেন ভবঘুরে-শিরোমণি। ভবঘুরে ধর্মের চর্যায় তিনি ছোটবড় সব রকমের বাধা আর বৃত্তি ত্যাগ করেছিলেন। ঘরদোর আর নারী সন্তান তো বটেই এমন কি বস্ত্রও বর্জন করেছিলেন। "করতল ভিছা, তরুতল বাস" তথা দিক্-অম্বরকে তিনি এ জন্যেই আদর্শ করেছিলেন যাতে নির্দ্বন্দ্ব বিচরণে কোনো বাধা না থাকে। দিগম্বর বলার জন্য শ্বেতাম্বর বন্ধুরা আবার যেন অসন্তুষ্ট হবেন না! বস্তুত আমাদের বৈশালীর এই মহান ভবঘুরে কোনো কোনো ব্যাপারে দিগম্বরদের কল্পনার অনুরূপ ছিলেন আবার কোনো কোনো ব্যাপারে ছিলেন শ্বেতাম্বরদের উল্লেখের অনুরূপ। কিন্তু একটা বিষয়ে তো উভয় সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায় বহির্ভূত মরমী ব্যক্তিরা একমত যে ভগবান মহাবীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নন, প্রথম শ্রেণীর ভবঘুরে ছিলেন। আজীবন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। বৈশালীতে জন্মে ঘুরতে ঘুরতে পাওয়ায় তিনি দেহত্যাগ করলেন। আর বুদ্ধ ও মহাবীরের চেয়ে বড় কোনো ত্যাগ, তপস্যা ও সহৃদয়তার দাবি যদি কেউ করেন তাহলে আমি তাঁকে শুধু দাম্ভিক বলব। আজকাল কুটির বা আশ্রম বানিয়ে কলুর বলদের মতো কত লোক নিজেদের অদ্বিতীয় মহাত্মা বলেন বা চেলাদের দিয়ে বলান। কিন্তু আমি বলি, বিনা ভবঘুরেমিতে যদি মহাপুরুষ হওয়া যায় তাহলে তো অলিতে গলিতে গণ্ডায় গণ্ডায় মহাপুরুষ দেখা যেত। আমি তো জিজ্ঞাসুদের সাবধান করে দিতে চাই

যে, তাঁরা যেন এই সব বারফট্টাইওয়ালা মহাত্মা আর মহাপুরুষদের পাল্লায় না পড়েন। এরা নিজেরা কলুর বলদ তো বটেই আবার অন্যদেরও তাই বানাতে চান।

বুদ্ধ ও মহাবীরের মতো সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মহাপুরুষদের ভবঘুরেমির কথা থেকে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে অন্যেরা ঈশ্বরের ভরসায় গুহা বা কুঠরির মধ্যে বসে বসেই সকল সিদ্ধি পেয়ে গিয়েছেন বা পেয়ে যান। তা যদি হতো তাহলে শঙ্করাচার্য, যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন, ভারতের চার প্রান্তে চষে বেড়ালেন কেন? শঙ্করকে কোনো ব্রহ্ম শঙ্কর বানাননি, তাঁকে বড় তৈরী করার মূলে যদি কেউ থাকে তাহলে সেটা এই ভবঘুরে ধর্ম। শঙ্কর চিরদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন— আজ কেরলে তো কয়েক মাস পরে মিথিলায় আবার পরের বছর হয়ত কাশ্মীরে বা হিমালয়ের কোনো অপর অংশে। তরুণ বয়সেই তিনি মারা যান কিন্তু তার সংক্ষিপ্ত জীবনকালে তিনি যে শুধু তিন ভাষ্য লিখলেন তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে আপন আচরণ অনুসারে ভবঘুরেমির পাঠ দিয়ে গেলেন যা পালন করবার লোক আজ শয়ে শয়ে দেখা যায়। ভাস্কো ডা-গামা ভারতে আসার অনেক আগে শঙ্করের শিষ্য মস্কো আর ইউরোপে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁর সাহসী শিষ্যরা শুধু ভারতের চার প্রান্ত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, অনেকে বাকুতে (রাশিয়া) গিয়ে ধুনী জ্বালিয়ে বসেছিলেন। একজন তো ঘুরতে ঘুরতে ভোল্‌গা পাড়ের নিঝনিনভোগ্রাদের প্রসিদ্ধ মেলাও দেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি কিছুদিনের জন্যে সেখানে আস্তানা গেড়ে সেখানকার খৃস্টানদের মধ্যে থেকে কিছুসংখ্যক লোককে আপন ধর্মমতের দিকে টানলেন, যাদের সংখ্যা তলে তলে বাড়তে বাড়তে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে লাখের কাছাকাছি পৌঁছেছিল।

রামানুজ, মাধবাচার্য এবং অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যদের অনুগামীরা আমাকে ক্ষমা করবেন যদি আমি বলি যে, ওঁরা ভারতে কূপমণ্ডূকতা প্রচারে বড় সহায়তা করেছেন। জয় হোক রামানন্দ ও চৈতন্যের, যারা পঙ্কের পঙ্কজ হয়ে আদিকাল থেকে প্রচলিত মহান ভবঘুরে ধর্মকে আবার তার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তার ফলে প্রথম শ্রেণীর না হোক অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক ভবঘুরের উদ্ভব হলো। সে বেচারিরা বাকুর বড় জ্বালামুখী পর্যন্ত আর কি করে যাবেন! তাঁদের পক্ষে মানস সরোবরে যাওয়াটাই ছিল অসম্ভব। নিজের হাতে রান্না করতে হবে, মাংস-ডিমের ছোঁয়া লাগলে আবার ধর্ম চলে যাবে, হাড় কাঁপানো শীতে প্রতিটি লঘুশঙ্কার ক্ষেত্রে কনকনে ঠাণ্ডা জলে হাত ধুতে হবে আর প্রতিটি মহাশঙ্কার ক্ষেত্রে করতে হবে স্নান আর সেটা তো

একেবারে যমরাজাকে হাত ধরে ডেকে আনার সমান! তাই বেচারিদের রয়ে সয়ে ভবঘুরেমি করতে হয়ে ছিল। এতে কার সন্দেহ হতে পারে যে, শৈব বা বৈষ্ণব, বেদান্তী বা সদান্তী যেই হোক সবাইকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে শুধু ভবঘুরে ধর্ম।

মহান ভবঘুরে ধর্ম বৌদ্ধধর্ম, যে ভারত থেকে শুধু লুপ্ত হয়ে গেলো তাই নয়, তখন থেকে আমাদের দেশে কূপমণ্ডূকতার বোলবোলা বাড়ল। তারপর সাত শতাব্দী কেটে গেলো, আর এই সাত শতাব্দীর দাসত্ব ও পরাধীনতা আমাদের দেশে যে স্থায়ী হয়ে বসল এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। সমাজ-শিরোমণিরা যতই কূপমণ্ডূক বানাবার চেষ্টা করুন না কেন এ দেশের মাটিতে এমন ছেলেও জন্ম নিল যারা অঙ্গুলি নির্দেশ করল কর্মপথের দিকে। আমাদের ইতিহাসে গুরু নানকের কথা খুব বেশি দিনের নয়, তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের এক মহান ভবঘুরে। শুধু ভারত ভ্রমণে তিনি সন্তুষ্ট হননি, ইরান আরবেও গিয়েছেন। ভবঘুরেমি কোনো বড় যোগসাধনার চেয়ে কম সিদ্ধিদাত্রী নন, আর মানুষকে তো পয়লা নম্বরের নির্ভীক বানাতে তাঁর জুড়ি নেই। ভবঘুরে নানক মক্কায় গিয়ে তো কাবার দিকে পা মেলে শুলেন। মোল্লাদের মধ্যে যদি অতই সহিষ্ণুতা থাকত তাহলে তো তাঁরা অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। তাঁরা হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন আর নানকের পা দুটো ধরে অন্যদিকে ঘোরাতে চাইলেন। কিন্তু যে দিকে তাঁরা ভবঘুরে নানকের পা ঘোরান কাবাও সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে ঘুরে যায়। তাঁরা তো হতভম্ব! এটা অলৌকিক কাণ্ড। আজকের সর্বশক্তিমান কুঠরিবদ্ধ মহাত্মাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন যিনি নানকের মতো বুকের পাটা আর অলৌকিক কাণ্ড দেখাতে পারেন?

সুদূর অতীতের কথা ছেড়ে দিন। এক শতাব্দীও হয়নি, স্বামী দয়ানন্দ এ দেশ থেকে বিদায় নিয়েছেন। স্বামী দয়ানন্দকে কে ঋষি দয়ানন্দ বানাল? এই ভবঘুরে ধর্ম। ভারতের বেশিরভাগ জায়গাতেই তিনি ঘুরেছেন। বই লিখতে লিখতে, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে করতে তিনি তাঁর ভ্রমণ অব্যাহত রাখতেন। শাস্ত্র পড়েও কাশীর বড় বড় পণ্ডিতরা কূপমণ্ডূকে পরিণত হয়েছেন। তাই দয়ানন্দের মুক্তবুদ্ধি ও সুতার্কিক হবার কারণটা শাস্ত্রের বাইরে কোথাও খুঁজতে হবে। আর সেটা হলো তাঁর নিরন্তর ভবঘুরেমি ধর্মের বায়ুসেবনের রহস্য। সমুদ্র যাত্রা, দ্বীপ-দ্বীপান্তরে যাওয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে যা কিছু অনড় অটল অনুশাসন বানানো হয়েছে সে সবই তিনি ছিঁড়ে কুটিকুটি করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, মানুষ স্থাবর বৃক্ষ নয়— সে জঙ্গম প্রাণী। চলা মানুষের ধর্ম। সেটা যদি কেউ ভুলে যায় তাহলে সে মানুষ হবার অধিকারী নয়।

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ভবঘুরেদের সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন দেখি না। এ পর্যন্ত যা আলোচনা করেছি তাতে বোঝা যায় যে পৃথিবীতে যদি কোনো অনাদি সনাতন ধর্ম থেকে থাকে তাহলে সেটা ভবঘুরে ধর্ম। কিন্তু সেটা কোনো সংকীর্ণ সম্প্রদায়-আশ্রয়ী নয়, আকাশের মতো তা উদার এবং সমুদ্রের মতো বিশাল। কোনো ধর্ম যদি অধিক যশ ও মহিমা লাভ করে থাকে তাহলে তার কারণ এই ভবঘুরে ধর্ম। প্রভু যীশু ভবঘুরে ছিলেন, তাঁর অনুগামীরাও আবার তেমনি ভবঘুরে ছিলেন যাঁরা যীশুর বার্তা পৃথিবীর সকল প্রান্তে ছড়িয়ে দিলেন। ইহুদী পয়গম্বররা ভবঘুরে ধর্মকে উৎসাহ দেননি। তার ফল তাঁদের বহু শতাব্দী ধরে ভুগতে হয়েছে। নিজেদের চেনা-জানা দুনিয়ার বাইরে তাঁরা পা ফেলেননি। ভবঘুরে ধর্মের প্রতি এ ধরনের গভীর অবহেলা দেখানোর ফল যা হতে পারে তাই হলো। তাঁদের হাত থেকে মশাল খসে পড়ল এবং সারা দুনিয়ায় ভবঘুরেমি করার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে নিরুৎসাহ দেখা দিলো। মারোয়াড়ি শেঠরা সেই আগুনটা নিলেন, অথবা বলা যায়, ভবঘুরে ধর্মের একটা ফুলকির জোরে মারোয়াড়ী শেঠরা বনে গেলেন ভারতের ইহুদী। আর যাঁরা এই ধর্মের প্রতি অবহেলা দেখালেন তাঁদের ঝরাতে হলো রক্তাশ্রু। আজ বিরাট রক্তক্ষয় আর দুহাজার বছরের ভবঘুরেমির অভিজ্ঞতার দামে বেচারিরা তাঁদের জমি ফিরে পেয়েছেন। আশা করা যায় যে, জমি ফিরে পাওয়ার পর তার মধ্যেই মাথা গুঁজে পড়ে থাকার দুবুদ্ধি আর হবে না। এইভাবে সনাতন ধর্ম থেকে পতিত ইহুদী জাতিকে তাদের সবচেয়ে বড় পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড ভবঘুরেমির রূপে ভোগ করতে হলো আর তাই আজ তাঁরা পা রাখবার মতো জমি পেয়েছেন। ভারত আজও এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। সে ইহুদীদের জমি আর রাজ্যকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। বড় বড় দেশগুলি যখন স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেছে তখন কতদিন পর্যন্ত এই হঠকারিতা চলবে? কিন্তু বিষয়ান্তরে না গিয়ে আমাদের যেটা বলার তা হলো এই যে, ভবঘুরে ধর্ম যে ইহুদীদের শুধু সফল ব্যবসায়ী বা উদ্যোগী জাতি তৈরি করেছে তাই নয় তাঁদের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সংগীত সমস্ত বিষয়েই পারদর্শিতা দেখাবার সুযোগ দিয়েছে। মনে করা হয়েছিল যে ব্যবসায়ী তথা ভবঘুরে ইহুদীরা যুদ্ধবিদ্যায় কাঁচা হবেন কিন্তু পাঁচ-পাঁচটি আরব সাম্রাজ্যের তাবৎ শেখদের তাঁরা মাটিতে পটকে দিলেন। সবাই নাকখত দিয়ে শেষে তাঁদের কাছে শান্তির প্রার্থনা করলেন।

এত কথা বলার পর এখন আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, ভবঘুরে ধর্মের চেয়ে বড় আর কোনো ধর্ম পৃথিবীতে নেই। ধর্ম তো সমান্য, কথা, তাকে ভবঘুরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়াটা 'মহিমা ঘটী সমুদ্র কী, রাবণ বসা

পড়োস'* জাতীয় কথা হয়ে দাঁড়ায়। ভবঘুরে হওয়া মানুষের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। এই পন্থা আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর কোনো কাল্পনিক স্বর্গের প্রলোভন দেখায় না। বরং সে বলতে পারে, 'ক্যা খুব সৌদা নকদ হ্যয়, ইস হাথ লে উস দে।' ভবঘুরেমি সেই করতে পারে যে নিশ্চিন্ত। কোন কোন বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করলে মানুষ ভবঘুরে হবার উপযুক্ত হয় সে কথা পরে বলা যাবে। কিন্তু ভবঘুরেমির জন্যে যেটা দরকার তা হলো নিশ্চিন্ত হওয়া। আর নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে দরকার ভবঘুরেমির। উভয়ের পরস্পর নির্ভরতা দোষের নয়, গৌরবের। ভবঘুরেমির চেয়ে বড় সুখ আর কিসে পাওয়া যাবে? বস্তুত ভবঘুরেমিতে ভাবনাচিন্তাহীন হওয়াই তো সুখের সবচেয়ে বড় লক্ষণ। ভবঘুরেমিতে কষ্টও আছে, তবে সেটাকে মনে করতে হবে যেন খাবার পাতে লঙ্কাটি! আর লঙ্কায় যদি ঝালই না থাকে তাহলে কি কোনো লঙ্কাপ্রেমিক সেটা ছোঁবেন? সত্যি বলতে কি, ভবঘুরেমিতে কোনো কোনো কষ্টের অভিজ্ঞতা ভবঘুরেমির রসকে আরো আস্বাদ্য করে তোলে। ব্যাপারটা ঠিক তেমনি, কালো রঙের পটভূমিতে কোনো ছবি যেমন আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভবঘুরেমির চেয়ে বড় কোনো জীবন্ত ধর্ম আর নেই। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ভবঘুরেদের ওপর। তাই আমি বলি প্রতিটি তরুণ তরুণীর উচিত ভবঘুরের ব্রত গ্রহণ করা। এর বিরুদ্ধে উচ্চারিত সমস্ত প্রমাণকে মিথ্যা ও আবর্জনা মনে করা উচিত। যদি মাতা পিতা এর বিরুদ্ধে যান তাহলে বুঝতে হবে যে তাঁরা প্রহ্লাদের মাতাপিতার নবীন সংস্করণ মাত্র। যদি বন্ধু-বান্ধব বাগড়া দেন তাহলে বুঝতে হবে যে তাঁরা শত্রু। যদি ধর্মগুরু কিছু উল্টোপাল্টা যুক্তি দেখান তাহলে মনে করতে হবে যে এইসব ভণ্ড সমাজকে কখনো সত্য ও সরল পথে চলতে দেয়নি। যদি দেশ ও দেশের নেতারা আইনের জোরে বাধা সৃষ্টি করতে চান, তাহলে হাজার হাজার বার প্রমাণিত সত্যের জোরে বলতে হয় যে, মহানদীর বেগের মতো ভবঘুরের গতিকে রুখবার মতো পৃথিবীতে কেউ জন্মায়নি। কঠোর প্রহরাবেষ্টিত কত সব রাজ্যসীমান্ত ভবঘুরেরা চোখে ধুলো দিয়ে পার হয়ে গিয়েছেন। আমি নিজেও একাধিকবার এটা করেছি (প্রথম তিব্বত-যাত্রায় আমাকে ইংরেজ, নেপাল রাজ্য ও তিব্বতের সীমান্ত প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে যেতে হয়েছিল)।

---

* রাবণ পড়শি হলো বলে সমুদ্রের মহিমা ক্ষুণ্ন হলো। অ.